স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হেলথ হোম

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২২

রক্ত সঞ্চালনের ক্রমবিবর্তন

ডাঃ কে কে বারুই

অধিকর্তা, বাঙ্গুর সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, ব্লাডব্যাঙ্ক

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা জন্মের পর থেকেই কি এবং কেন এর উত্তর খুঁজে এসেছে, কখনো উত্তর পেয়েছে কখনো বা উত্তর পেতে অনেক অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে, আবার কখনো উত্তর তখনকার মতো অধরাই রয়ে গিয়েছে। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে প্রত্যেকটি কারণ ও সমাধান দুই-ই পৃথিবীতে রয়েছে যা আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

আমরা কিছু কিছু উত্তর পেয়ে গিয়েছি আর কিছু সমস্যার উত্তর খোঁজার চেষ্টা এখনও জারি রয়েছে। Penicillin আবিষ্কারের আগে বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণুর আক্রমণে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে যা ডাক্তাররা ও বিজ্ঞানীরা অসহায়ের মতো দেখেছেন। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা ছিল অসহায় মানুষদের এই মৃত্যু মিছিল আটকানোর। একদিন নিরলস গবেষণার মাধ্যমে বরেণ্য বিজ্ঞানী Alexander Flemming আবিষ্কার করেন এই সব রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে অমোঘ এক অস্ত্র Penicillin। এই আবিষ্কারের ফলে Medical Science- এর এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। যদিও Penicillin এর ব্যবহার শুরু হতে আরও দশ থেকে পনের বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এইভাবে একটা বাধা মানুষ পার হয়েছে।

আমাদের ডাক্তারি পড়ার সময় 'CANCER' চ্যাপ্টার পড়াতে এসে আমাদের প্রফেসর বোর্ডে লিখেছিলেন "Cancer has no answer, but we have to learn to find out the answer"। অসীম ধৈর্য্য ও মননের সঙ্গে এখনও চলছে Cancer এর answer খোঁজার কাজ। সাফল্য একদিন অবশ্যই আসবে। অনুরূপভাবে রক্ত সম্পর্কেও মানুষের জিজ্ঞাসা, অজানাকে জানার আগ্রহে একদিন আবিষ্কার হয় শরীরের মধ্যে রক্তের উপস্থিতি, রক্তের সংবহন ব্যবস্থা, রক্তের কাজ এবং প্রয়োজনীয়তা।

মানুষের শরীরে রক্তসঞ্চালন এর ইতিহাস অনেক পুরনো। রক্তসঞ্চালন বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কারণে, বিজ্ঞানীরা করেছেন তখনকার ধারনা অনুযায়ী যা বেশিরভাগ সময় সফল হয়নি। কখনো যৌবন পুনরুদ্ধারে, কখনো বা শক্তিবর্ধক হিসাবে, কখনো শারীরিক দুর্বলতা দূর করতে রক্ত সঞ্চালন হয়েছে। কখনো কুকুর থেকে কুকুরে, কখনো কুকুর থেকে মানুষে, কখনো ভেড়া থেকে মানুষে বা কখনো মানুষ থেকে মানুষে। সরাসরি এই রক্ত সঞ্চালনের ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্তদাতা ও রক্তগ্রহীতার মৃত্যু হয়েছে। এইভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে চলতে ১৬৬৫ সালে প্রথম সফল রক্তসঞ্চালন করতে সক্ষম হন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ফিজিশিয়ান Dr. Richard Lower , কিন্তু এটা ছিল একটা কুকুর থেকে অন্য কুকুরের দেহে সরাসরি রক্তসঞ্চালন এবং দাতা, গ্রহীতা কুকুর বেঁচে যায়। ১৬৬৭ সালে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী jean Baptiste Denis এবং ইংল্যান্ডের Richard Lower ও Edmund King ভেড়ার শরীর থেকে মানুষের শরীরে সরাসরি রক্তসঞ্চালন করেন এবং অবিশ্বাস্যভাবে রক্তগ্রহীতা বেঁচে যায় যা একটা Miracle হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই সাফল্য পেতে প্রচুর মানুষের শরীরে ভেড়া থেকে রক্তসঞ্চালন হয় এবং প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। ফলে তৎকালীন ফ্রান্স পার্লামেন্ট মানুষের শরীরে রক্তসঞ্চালন Officially Ban করে দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা থেমে থাকেননি। মানুষ থেকে মানুষের শরীরে রক্তসঞ্চালন চলতে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এইভাবে চলতে চলতে ১৮১৮ সালে ইংল্যান্ডের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ Dr. James Blundell এক সংকটাপন্ন Post Parturm Heamorage এর রোগীকে অন্য মানুষের শরীর থেকে সরাসরি রক্তসঞ্চালন করে তার প্রাণ বাঁচান। এই ব্যাপারগুলো চলছিল অনুমানভিত্তিক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক-এ। কতটা রক্ত দিতে হবে, কতক্ষণ ধরে দিতে হবে বা রক্তদাতা থেকে কতটা রক্ত নেওয়া যাবে, ছিল না কোনো সম্যক ধারণা। ছিল না কোনো সুলভ ও উন্নত যন্ত্রপাতি। এইভাবেই চলতে লাগল রক্তসঞ্চালন, এতে কেউ মরলো, কেউ বাঁচলো। কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়; আপাতকালীন মুহূর্তে সঠিক রক্তদাতা না পাওয়া। ফলে তৈরি হল এক পেশাদার রক্তদাতা শ্রেণীর, তারা দিনের পর দিন অর্থের বিনিময়ে রক্ত দিতে লাগল এবং বেশ কিছু রোগীর রক্ত নেওয়ার অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। এই অনুমানভিত্তিক রক্ত সঞ্চালনের অবসান ঘটতে আরও প্রায় শতাব্দীকাল লেগে গেল। ১৯০১ সাল - রক্তসঞ্চালন এর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মাইলফলক। অস্ট্রিয়ার প্যাথলজিষ্ট প্রণম্য Dr Karl Landsteiner পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে চালাতে আবিষ্কার করেন রক্তের A,B,O group।

এই আশ্চর্য আবিষ্কারের পরে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে রক্ত দেওয়া শুরু হল। তাতেও কিছু বিপত্তি দেখা দিতে লাগল। ফলশ্রুতিতে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে ১৯০৭ সালে Cross matching এর ধারণা জন্ম নেয়। Dr. Ludvig Hektoen প্রথম Cross Matching এর প্রস্তাব দেন। দাতা ও গ্রহীতার রক্ত মিশিয়ে এবং রক্ত জমাট না বাঁধলে রক্ত সঞ্চালনের প্রস্তাব দেন। সেই মতো Dr. Reuben Offenberg প্রথম রক্তের গ্রুপ দেখে ও Cross Matching করে রক্ত সঞ্চালন করা যাচ্ছিল। এইভাবেই চলছিল কিন্তু বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও সমান চলতে থাকে। পরিশেষে ১৯৩৯ সালে Dr Karl Landsteiner, Alexander Wiener, Philip Levine এবং R. E. Stetson একযোগে গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেন 'Rh Blood group system' যার মাধ্যমে রক্তের Positive ও Negataive group চিহ্নিত হয় এবং Cross Matching করে এক নির্ভুল রক্ত নির্বাচন করা সম্ভব হয়। রক্ত গ্রহীতার রক্তসঞ্চালনজনিত সমস্যা প্রায় পুরোপুরি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

(এরপর ৩য় পাতায়)

বিশেষ চাহিদা - কোন যুক্তিতে অন্তরণের কারণ?

উর্বা চৌধুরী

কো-অর্ডিনেটর, স্পেশাল প্রজেক্ট, প্রতীচি ট্রাস্ট (ইণ্ডিয়া)

মানুষের পক্ষে কোনো কাজ করে উঠতে পারা বা না পারা-র প্রতি সমাজে এক উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া রয়েছে — যে প্রতিক্রিয়া কখনো সামাজিক, কখনো সাংস্কৃতিক, কখনো অর্থনৈতিক, কখনো বা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি, সিদ্ধান্ত, আইনকানুন সবটাকেই প্রভাবিত করে উঠতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম বুনিয়াদি প্রশ্নগুলি হল - কাকে বলে 'পারা', কাকেই বা বলে 'না পারা'? এই ধারণা দুটির আর্থ-সামাজিক, বা সমাজ-রাজনৈতিক অভিঘাত কেমন? ঠিক কোন সীমায় পৌঁছে এই পারা বা না পারা-র বোঝাপড়া সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করে? কোন ক্ষমতার কাঠামোর বাতাবরণে কোন কোন প্রকারে কোনো মানুষের ''সক্ষমতা'', বা ''অক্ষমতা''-র কারণে তারই হকের সমাজে, দেশে, রাষ্ট্রে তার সমাদর, তার প্রতি বৈষম্য, তার অন্তর্ভুক্তি, কখনো বা তার বর্জন অবধিও ঘটে যায়?

বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন মানুষ ও বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ, এবং রাজৈনতিক প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের 'সক্ষমতা' এবং 'অক্ষমতা'-র ভূমিকাকে নানাভাবে দেখা সম্ভব - তবে তা নিয়ে লেখালেখি, আলোচনা, চর্চা, এমনকি তর্ক-প্রতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয় তখনই যখন দেখা যায় যে, নির্মিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, বা নীতিতে, বা নীতির প্রণয়নে কোথাও অসাম্য, বিভেদ, তাচ্ছিল্য, অধিকার লঙ্ঘনের বাস্তবতা রয়ে গেছে।

গণতান্ত্রিক সমাজে গড়পড়তা হিসাবে কিছু পরিস্থিতি সুনিশ্চিত হলে তবেই আমরা সেই সমাজকে তার বাসিন্দাদের জন্য বাসযোগ্য সমাজ হিসাবে চিনি, যা ''সমাজ'' শব্দটির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয় - যে পরিস্থিতিতে সব মানুষ নির্দিষ্ট সমাজটিতে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য তার ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক সুযোগসুবিধাগুলি সমতার রীতি অনুযায়ী পায়, যে পরিস্থিতিতে সব মানুষ সমাজে পূর্ণ যোগদানের সুযোগ পায়, অন্তত তার মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র দ্বারা এনমনকি সহনাগরিকদের সহযোগে সুনিশ্চিত হয়, এবং যে পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক সম্পদ অবধি সবার সমান পৌঁছ থাকে। আর এই গোটা অনুকূল পরিস্থিতি তৈরির ক্ষেত্রে সমাজের সকলের যুথবদ্ধ চলন, স্বার্থরক্ষা, কাজ করে চলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আবার ভিন্ন কোণ থেকে যদি এই পরিস্থিতিগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে দেখা যাবে, মানুষ সমাজ গড়েছিলই এই জন্য - সে যৌথযোগে থাকতে চায়। আদর্শ কোনো সমাজে যে আনুকূল্যের কথা উল্লেখ করা হল - তাতে করে প্রথম যে বিষয়টি তার পরিপন্থী হয়, তা হল কোনো সমাজ নির্মিত পরিচিতির (জাত, জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ পরিচয়) কারণে বা ক্ষমতা ও চাহিদার মাপজোক করে কোনো গোষ্ঠীর বহির্ভূতকরণ, বর্জন, অন্তরণ। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে আমাদের সকলের পক্ষে লজ্জার কথা হল - গোটা পৃথিবীতে বাস্তবিকই বহির্ভুতকরণ, বর্জন, অন্তরণের মতো মতো ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে। এবং আশার কথা হল সেই তরুটি মেরামতি দরকার উপলব্ধি করেই অন্তর্ভুক্তকরণের উদযোগও আবার বেশ কয়েয়ক দশক ধরে চলছে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে ঘটা বহির্ভূতকরণের পরিস্থিতির সঙ্গে আমরা অতি পরিচিত। এই বহির্ভূতকরণের গোড়ায় যে গলদটা থেকে যায় তা হল - মানুষকে একটি যন্ত্রের মতো করে দেখার গলদ। তার শরীরে যা কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে বাড়তি, বা বিশেষ কোনো চাহিদার দাবি রাখে - তার প্রত্যেকটিকে ''বিশেষ তরুটি'' হিসাবে দেখে, সেই তরুটিকে ''মেরামত'' করার চেষ্টা করা, কোনোভাবে সেই তরুটি চিকিৎসাবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, মনোবিদ্যার দ্বারা ''মেরামত'' করা গেলে, গেল - নচেৎ আস্ত মানুষটিকে অসহায়, নিরুপায় করে দিয়ে সমাজ থেকে প্রকারন্তরে বহির্ভূত করা হবে। অর্থাৎ ''মেরামতি'' না করা গেলে, সমাজে ও সাাজিক পরিকাঠামোয় তেমন কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জন হবে না - অপরিবর্তিতত পরিকাঠামোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ টিকে যান, তাহলে তিনি সমাজের অংশ হবেন, অন্যথায় নয়।

এ জাতীয় ঘটনা আমরা দেখতে পাই ইস্কুল পরিকাঠামোর মধ্যে - গোড়ায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য কেবলই স্পেশাল স্কুলের

(এরপর ৩য় পাতায়)

সম্পাদকীয়

উত্তরবঙ্গের একটি ছোট্ট শহর গঙ্গারামপুরে বেশ বড় আকারে রাজ্য উৎসব হয়ে গেল স্টুডেন্টস হেলথ হোমের, গত ৩০ শে ডিসেম্বর। এবারে উৎসবে সাফল্যের মাত্রা প্রত্যাশার থেকে কিছু বেশীই।বহুদিন পর এতগুলি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিজ নিজ উৎসব করে রাজ্য উৎসবে তাদের প্রতিনিধি পাঠালো কার্যকরী ৩০টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যে ২৯টিই। প্রতিযোগী, অভিভাবক ও সংগঠক মিলিয়ে হাজারের উপর অতিথি অভ্যাগতদের গঙ্গারামপুরের সংগঠকরা পৌষের ওই প্রখর শীতে যে আতিথেয়তা দিলেন তা এক কথায় অতুলনীয়। কলকাতায় স্টুডেন্টস হেলথ হোম হাসপাতালের উদ্যোগে সুচিকিৎসায় মৃত্যু মুখ থেকে সুস্থ হয়ে কদিন আগেই কান্দিতে নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছিল ছাত্র ওয়াসিম কবীর। তার বাবা গঙ্গারামপুর ছুটে এলেন হোমকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করতে – স্টুডেন্টস হেলথ হোম আবার জাগছে।

সামনে একটি বড় কর্মসূচি। হোম তার দীর্ঘ ঐতিহ্য পরম্পরায় সংগঠিত করত পদযাত্রা। আলোড়ন পড়তো জনমানসে। বিবিধ কারণে এক দশকের বেশি তা বন্ধ. এ বছর আবার পদযাত্রা ফিরে আসছে। ''হাঁটো সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে / বাঁধো মানবতার বন্ধনে'' এই আহ্বানে সারা রাজ্যের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিকে মুখরিত করে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে (৭ই এপ্রিল) কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় পদযাত্রা। অতি সম্প্রতি স্টুডেন্টস হেলথ হোম আন্দোলনকে ঘিরে যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে তাকে আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে এবং হোমের সার্বজনীন হাসপাতাল ও অন্যান্য কর্মকান্ডের বহুল প্রচারের স্বার্থে আমরা এই পদযাত্রা করতে চাই। হোমের পত্রিকার মাধ্যমে এই পদযাত্রার আহ্বান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে অঙ্গনে প্রতিধ্বনিত হোক। সার্থক হোক শত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে স্টুডেন্টস হেলথ হোম আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা।

World Population Day

Anwesa Ghosh, *Teacher, Kolkata*

World Populaton Day is celebrated annually on 11 July to focus attention on the urgency and importance of population issues.

The Day was established by the then Governing Council of the UN Development Programme in 1989, an outgrowth of the interest generated by the Day of Five Billion, which was observed on 11 July 1987. By resolution 45/216 of December 1990, the UN General Assembly decided to continue observing World Population Day to enhance awareness of population issues, including their relations to the environment and development.

The Day was first marked on 11 July 1990 in more than 90 countries. Since then, a number of UNFPA national offices as well as other organizations and institutions, in collaboration with governments and civil society, have observed World Population Day.

To fulfil its mandate, UNFPA collaborates with a wide range of parties, both inside and beyond the framework of the United Nations, including governments, non-governmental organizations, civil society, faith-based organizations, leaders of the religious community and others. There are around 8 objectives to celebrate World Population Day.

The theme for this year is "A world of 8 billion : Towards a resilient future for all – Harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all."

Overpopulation has become a critical concern as the world's resources are being used up at an unsustainable rate. The major purpose of World Population Day is to raise awareness of all the negative impacts that population growth has on the steady development of nature.

According to UN Secretary General Antonio Guterres, "Sustainable Develop-ment 2030 agenda is the world's blueprint for a better future for all on a healthy planet. On World Population Day we recognize that this mission is closely interrelated with demographic trends including population growth aging migration, and urbanisation.

Population issue includes family planning, gender equality, child marriage, human rights, right to health, baby's health etc. Therefore, World population Day focuses on the importance of reproductive health and how it affects overall growth and development plans and programmes.

People all over the world, even in the present times, continue to experience harassment, discrimination, and violence because of their gender, class, religion, disability and country of origin. World Population Day 2022 provides an opportunity to highlight the face that the overpopulation issue, human rights violations, and gender inequality are more common that ever in emerging nations, take care of the alarming issues happening due to population increase like global warming and maintaining the balance between population growth and natural resources and ecosystem.

According to them, there are about 8 billion people living on Earth today but not all of them have equal rights and opportunities. Due to the fewer resources and uneven distribution of income, many people, who are financially or socially backward.

Our rapidly growing population threatens the survival well-being of human and hundreds thousands of other species on this planet.

This year, and always, we advocate for reproductive freedom and bodily antonomy for everyone everywhere, so that we can begin to bend the population curve back down to a sustainable level through voluntary access to family planning.

World population Day is celebrated to protect and empower youths of both gender girls and boys to offer them detail knowledge about their responsibilities to educate people to remove the gender stereotypes from society.

This event is celebrated in various countries around the world by hosting seminars and public discussion, whether virtual or at conferences. Educational sessions and workshops are also held by institutions. Slogans and banners are distributed and people post about it on social media.

Reaching a global population of eight billion is a numerical landmark, but our focus must always be on people. In the world we strive to build, 8 billion people means 8 billion opportunities to live dignified and fulfilled lives. When we act on our shared values, we contribute to our common future.

World population Day is all about raising awareness of controlling the population and the risks and consequences of disproportionate population - to - resources ratio. This is an occassion to celebrate our diversity, recognize our common humanity and marvel at advancements in health that have extended lifespans and dramatically reduced maternal and child mortality rates, according to the Secretary - General of the United Nations. The day was suggested by Dr. K C Zachariah in which population reached five billion when he worked as Sr. Demographer at World Bank. So, that's why every year on July 11, World Population Day is commemorated to increase public awareness of concerns realated to population growth. Its purpose has been to raise awareness of population control solutions.

স্টুডেন্টস হেলথ হোম — রাজ্য উৎসব - ২০২২

বিভাগ — ক বিষয়ঃ রবীন্দ্র নৃত্য
প্রথম — সমজ্ঞা সামন্ত, কাকদ্বীপ
দ্বিতীয় — সানভি গুহ রায়, কালিয়াগঞ্জ
তৃতীয় — আহ্নতা ঘোষ মেদিনীপুর

বিষয়ঃ আবৃত্তি
প্রথম — অদৃজা সাহা, নর্থ হুগলী
দ্বিতীয় — শ্রীজয়ী পাল, উত্তর কোলকাতা
তৃতীয় — শ্রেয়া লাঙ্গল, আমতা

বিষয়ঃ বসে আঁকো
প্রথম — দেবর্ণা কর্মকার, নর্থ হুগলী
দ্বিতীয় — অঙ্কিতা পাত্র, আমতা
তৃতীয় — বিধাত্রিকা রায়, কোচবিহার

বিভাগ — খ বিষয়ঃ নৃত্য
প্রথম — সায়নী কুণ্ডু, হাবড়া
দ্বিতীয় — ঔশানী দাস, কোলকাতা
তৃতীয় — তিয়াশা কর, কাকদ্বীপ

বিষয়ঃ আবৃত্তি
প্রথম — নিকিতা আক্তার, জিয়াগঞ্জ
দ্বিতীয় — অনন্যা সেনগুপ্ত, বহরমপুর
তৃতীয় — কঙ্কনা মজুমদার, উত্তর হুগলী

বিষয়ঃ বসে আঁকো
প্রথম — হিমাংশু বানিয়া, জলপাইগুড়ি
দ্বিতীয় — সঙ্গীতা রায়, রায়গঞ্জ
তৃতীয় — শ্রেয়সী হাজরা, আমতা

বিভাগ — গ বিষয় ঃ আবৃত্তি
প্রথম — মৌমিতা সেন, কোলকাতা
দ্বিতীয় — সমর্পিতা বর্মন, কালিয়াগঞ্জ
তৃতীয় — পামেলা সাহা, বহরমপুর

বিষয়ঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত
প্রথম — সমর্পিতা বর্মন, কালিয়াগঞ্জ
দ্বিতীয় — সৃজিতা দাস, জিয়াগঞ্জ
তৃতীয় — শারোদ্বত দেব, জলপাইগুড়ি

বিষয়ঃ বসে আঁকো
প্রথম — অঙ্কুশ মিত্র, নর্থ হুগলী
দ্বিতীয় — সুদীপ্ত কর, মেদিনীপুর
তৃতীয় — পুষ্পিতা দাস, কাটোয়া

বিভাগ — ঘ বিষয়ঃ আবৃত্তি
প্রথম — অভিজ্ঞান ব্যানার্জী, মেদিনীপুর
দ্বিতীয় — তৃষিতা আঢ্য, বহরমপুর
তৃতীয় — অঙ্কিতা দাস, জঙ্গীপুর

বিষয়ঃ নজরুল গীতি
প্রথম — সিঞ্চন মান্না, কাকদ্বীপ
দ্বিতীয় — সায়নি তরফদার, গঙ্গারামপুর
তৃতীয় — প্রভাতী নস্কর, কোলকাতা

বিষয়ঃ প্রবন্ধ
প্রথম — অঙ্কিতা মন্ডল, বহরমপুর
দ্বিতীয় — দেবাদৃতা মন্ডল, হাবড়া
তৃতীয় — কোয়েল দেবশর্মা, কালিয়াগঞ্জ

বিভাগ — ঙ বিষয়ঃ আবৃত্তি
প্রথম — অর্পিতা পাল, বেলঘড়িয়া
দ্বিতীয় — সায়ন হালদার, কাকদ্বীপ
তৃতীয় — সিজা বসাক, গঙ্গারামপুর

বিষয়ঃ অতুলপ্রসাদের গান
প্রথম — শান্তনু দে, হাবড়া
দ্বিতীয় — অলিভিয়া সিংহরায়, রায়গঞ্জ
তৃতীয় — দোলন সরকার, কাকদ্বীপ

বিষয়ঃ বিতর্ক (পক্ষে)
প্রথম — ভুবন ভৌমিক, উত্তর কোলকাতা
দ্বিতীয় — মানব দেব, কালিয়াগঞ্জ
তৃতীয় — সুতীর্ণ কোলে, আমতা
বিপক্ষে —
প্রথম — হৈমন্তী চ্যাটার্জী, কান্দি
দ্বিতীয় — রাজন্যা চ্যাটার্জী, নর্থ হুগলী
তৃতীয় — অভ্রনীল মজুমদার, হাবড়া

বিভাগ — চ বিষয়ঃ আবৃত্তি
প্রথম — সহেলী পাল, বহরমপুর
দ্বিতীয় — মিতু সরকার, গঙ্গারামপুর
তৃতীয় — অন্বেষা নাগ, মেদিনীপুর

বিষয়ঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত
প্রথম — মণিদীপা দাস, কাকদ্বীপ
দ্বিতীয় — সায়ন্তিকা বসু, কৃষ্ণনগর
তৃতীয় — পূজা দত্ত, বহরমপুর

বিষয়ঃ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা
প্রথম — সুরজিৎ ঘোষ, মেদিনীপুর
দ্বিতীয় — শান্তনু ঘোষ, জলপাইগুড়ি
তৃতীয় — সায়ন্তনী বসু, কৃষ্ণনগর

যোগাসনঃ
বিভাগঃ খ (বালক)
প্রথম — সায়ন কর্মকার, নর্থ হুগলী
দ্বিতীয় — অয়ন পাত্র, আমতা
তৃতীয় — প্রিতম আঢ্য, উত্তর কোলকাতা

বিভাগঃ খ (বালিকা)
প্রথম — পরম্পরা বিশ্বাস, বহরমপুর
দ্বিতীয় — প্রমিতা সিং, নর্থ হুগলী
তৃতীয় — সুমিতা ঝকড়, কাকদ্বীপ

প্রশ্নোত্তর (QUIZ)
প্রথম — কোচবিহার
(শরদিন্দু ঘোষ, সায়নদ্বীপ মোদক, দেবাদিত্য সরকার।
দ্বিতীয় — গঙ্গারামপুর
(উৎকর্ষ তালুকদার, সৌভিক সরকার, অরিত্র রায়)
তৃতীয় — কাটোয়া
(সৌমদীপ ঘোষ, অনীশ কোনার, তপোজ্যোতি রাই)

১ম পাতার পর..... **রক্ত সঞ্চালনের ক্রমবিবর্তন**

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। রক্তসঞ্চালন নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল তার সবই ছিল সরাসরি রক্তসঞ্চালন অর্থাৎ দাতা থেকে গ্রহীতাকে। এতে সমস্যা হল সময় মতো দাতা না পাওয়া এমনকি আত্মীয় পরিজনেরও রক্তদানে ভীতিজনিত কারণে অনিচ্ছা প্রকাশ করা। কারণ রক্তদান প্রক্রিয়া এখনকার মতো এত সহজ ও মসৃণ ছিল না। দাতাকে অনেকক্ষণ হাসপাতালে আটকে থাকতে হতো এমনকি কিছু দাতা রক্তদানের পর ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়তো। ফলে টাকার বিনিময়ে রক্তদাতার জন্ম হলো। কিন্তু তখন এই ধরনের দাতা থেকে রক্ত কিনতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতো যা অনেক সময় সাধারণ মানুষেরর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে আবার গবেষনা। কিভাবে রক্ত মানব শরীরের বাইরে মজুত রাখা যায় এবং প্রয়োজনে রোগীর শরীরে সঞ্চালন করা যায়। এভাবেই পরোক্ষ রক্তসঞ্চালনের চিন্তাভাবনা বিজ্ঞানীদের গবেষনার বিষয় হয়ে উঠলো।

মানব শরীরের বাইরে রক্ত তরল রাখার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানাধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার শুরু করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জোঁকের এক ধরনের উৎসেচক হিরুডিন, এছাড়া Oxalates, bi-carbonate, Phosphate প্রভৃতি। এতে রক্ত তরল থাকলেও মানবশরীরে মারাত্মক বিষক্রিয়া তৈরি করে, ফলে এগুলোর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী Dr Alber Hustein ১৯১৪ সালে প্রথম Anticoagulant হিসাবে Sodium Citrate ব্যবহার করেন এবং সাফল্য অর্জন করেন। ১৯১৫ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী Dr Lewison, Sodium Citrate এর সঠিক পরিমান নির্ধারক করে রক্তকে অনেক ক্ষণ তরল রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু দীর্ঘদিন সংগৃহীত রক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

রাশিয়ান বিজ্ঞানী Dr Andre Bagdasarov সোডিয়াম সাইট্রেটে পরিমাণ মতো Dextrose মিশিয়ে রক্তকে 40 ডিগ্রী সেলসিয়াসে ২১ দিন রাখতে সক্ষম হন।এভাবেই একের পর এক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সোডিয়াম সাইট্রেট ও Dextrose এর পরিমান নির্ধারন করা হয় এবং রক্ত ২১ দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে এলো রক্ত সংগ্রহ করে মজুত রাখার ব্যবস্থাকরণ। রাশিয়ান বিজ্ঞানী Dr Alexander Bogdanov ১৯২৬ সালে মস্কোতে এইরকমই এক সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন যার নাম "Central Institute of Haematology"। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে রক্ত সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালে স্পেনের মাদ্রিদে Dr Norman Bethune পৃথিবীর প্রথম Blood bank গড়ে তোলেন এবং এর পরপর পৃথিবীর আরও বিভিন্ন দেশে এইরকম Blood bank গড়ে ওঠে।

এই সময় রক্ত সংগ্রহ করা হতো কাঁচের বোতলে কিন্তু এতেও কিছু কিছু অসুবিধা দেখা যায়। বিশেষত রক্তের Transport এর অসুবিধা, বোতল ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা, অনেক জায়গার প্রয়োজন আবার কিছু ক্ষেত্রে বোতলের মধ্যে air bubbles দেখা যায় যা রক্তসঞ্চালন এর সময় রোগীর শরীরে ঢুকে রোগীর জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে। ফলে নতুনের সন্ধানে আরও গবেষণার ফলাফলও পাওয়া গেল। ১৯৪৭ সালে Harvard Medical School এর প্রফেসর Carl. W. Walter আবিষ্কার করেন PVC (Polyvinyl Chloride) Plastic Resin Blood Container বোতল যা পরবর্তীতে অন্যান্য কিছু রাসায়নিক মিশিয়ে তিনি উদ্ভাবন করেন Soft, Flexible, Pliable ব্যাগ যা সহজে বহন করা সম্ভব এবং Air bubbles ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

না বিজ্ঞানে কোনো কিছুই শেষকথা নয়, তাই চলতে থাকে বিজ্ঞান সাধনা। ফলে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকে ও নব্বই দশকের প্রথম ভাগে আরও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রক্ত CPD সহযোগে সর্বোচ্চ ২৮ দিন ও CPDA ও CPDA-1 সহযোগে সর্বোচ্চ ৩৫ দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হলো। কোথাও কোথাও আবার SAGM, ADSOL, Anti coagulants ব্যবহার করে ৪২ দিন পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণ করা হয়। আমাদের দেশে ৩৫ দিন পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণ করা হয়। রক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা তো হলো কিন্তু এই রক্ত রোগীর শরীরে চালানোর পর কিছু কিছু রোগীর নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হতে লাগলো এবং সেগুলো যখন যেমন শনাক্ত করা গেল বিজ্ঞানীরা সেই মতো ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। ফলে রক্ত দাতার রক্তের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হলো এবং রক্ত ঠিক থাকলে রোগীকে দেবার ছাড়পত্র দেওয়া হলো। এইভাবে ১৯৪৭ সালে সিফিলিসের টেস্ট, ১৯৭১ সালে হেপাটাইটিস বি এর টেস্ট, ১৯৮৫ সালে HIV-র জন্য টেস্ট, ১৯৯২ সালে HIV-1 এবং HIV-2 এর টেস্ট এবং সবশেষে ২০০২ সালে হেপাটাইটিস সি এর টেস্ট শুরু হল। এবং এই টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ হলে একমাত্র তখনই সেই রক্তকে উপযুক্ত বলে রোগীর শরীরে সঞ্চালন এর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। পৃথিবীর সবদেশে এই টেস্টগুলো আবশ্যিক।অবশ্য কিছু দেশে যেমন জাপান, চীনে, আরও অনেক টেস্ট করে রক্তকে চালানোর উপযুক্ত বলে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

এইভাবেই সারা বিশ্বব্যাপী চলছে রক্তসঞ্চালনের কর্মকান্ড। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের সাধনা কি থেমে আছে? না, বরং পরবর্তী ধাপে উন্নীত হবার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা অব্যাহত। এবার চলছে কৃত্রিম ভাবে রক্ত তৈরির প্রয়াস। চেষ্টা যখন চলছে সাফল্য একদিন অবশ্যই আসবে। দেখা যাক বিজ্ঞান সাধনা আমাদের কি উপহার দেয়।

১ম পাতার পর..... **বিশেষ চাহিদা .....**

বন্দোবস্ত ছিল যেখানে সমাজের আর পাঁচটা শিশু যেত না। তারা সকলে যেত সাধারণ ইস্কুলে। ইস্কুল পরিধিতে সাধারণ ইস্কুল আর স্পেশাল স্কুল সম্পূর্ণ আলাদা - দুই রকম প্রতিষ্ঠান। মূলস্রোতের সমাজে স্পেশাল স্কুল মিশে যেতে পারে না। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা মিশে যেতে পারে না মূলস্রোতের ইস্কুলের শিশুদের সঙ্গে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিশেষ চাহিদাকে কেবলই ত্রুটি হিসাবে গণ্য করে তাদের জন্য বিশেষ (স্পেশাল) ইস্কুল - কারণ মূলস্রোতের সাধারণ ইস্কুল কোনোপ্রকার পরিবর্তন করতে নারাজ শুধু নয়, তারা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে গ্রহণ করতে নারাজ। এই প্রেক্ষিতে সমান্তরাল প্রশ্ন ওঠে - সেই যে স্পেশাল স্কুল, সেগুলির দায় দায়িত্ব কার? দেখা যায় হাতে গোনা কটি বাদে যে কটি স্পেশাল স্কুল রয়েছে, তা বেসরকারি। অর্থাৎ একদিকে মূলস্রোতের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, প্রকারান্তরে মূলস্রোতের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রইল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা, অন্যদিকে, তাদের শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেশাল স্কুলও গড়ে দিল না - তাদের শিক্ষার, সার্বিক বিকাশের (যা কি না শিক্ষার মূল লক্ষ্য) অধিকার সুনিশ্চিত করার দায় রাষ্ট্র নিল না। গোড়া থেকে সুযোগে বঞ্চিত থাকায় সাধারণের জন্য তৈরি ইস্কুলে তারা মানিয়ে নেওয়ার মতো করে তৈরিও হতে পারল না। এই ছিল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সামর্থ্য, প্রয়োজন, অবস্থা সম্পর্কে সামাজিক বোঝাপড়া। এই যে বহির্ভূতকরণের প্রভাব তা কেবল সামাজিক বোঝাপড়া। এই যে বহির্ভূতকরণের প্রভাব তা কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, তা শিশুর সামগ্রিক সামাজিক মেলামেশাকেও সীমিত করে দেয় - কারণ প্রতি পদক্ষেপ-এ শিশু এবং তার পরিবার টের পাচ্ছিল শিশুর গোটা দিনের আসল সময় যে সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কি না ইস্কুলে কাটে সেই ক্ষেত্রেই তার অন্তরণ ঘটে, তাহলে বাকি ক্ষেত্রেও তার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। ফলে এই বোঝাপড়া শিশুকে পারিবারিক অনুষ্ঠানে, সামাজিক উৎসবেও মিশতে দিতে চায় না।

পরবর্তী সময়কালে যখন এই দৃষ্টিভঙ্গির খানিক বদল ঘটল, বোঝা গেল যে, এভাবে কোনো মানুষের বিশেষ চাহিদাকে তার ব্যক্তিগত 'ত্রুটি' হিসাবে, ব্যক্তি 'প্রতিবন্ধকতা' হিসাবে গণ্য করা যায় না - সমাজ যদি মননে, চিন্তনে, পরিকাঠামোয় তার কোনো একজন মাত্র সদস্যের জন্যও অনুকূল না হয়ে উঠতে পারে, তাহলেও তা সমাজ-রাজনৈতিক পরিকাঠামোর ত্রুটি, রাষ্ট্রের ব্যর্থতা, প্রতিবন্ধকতা। কারণ, সমাজ তৈরিই হয়েছিল সকলকে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার উপায় করে দেবে, সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে, সকলের যোগদান, সুযোগ, অধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করবে - এই প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটে। এই চালচিত্রেই কিছু সাধারণ স্কুলগুলি বদলে হতে থাকে ইন্টিগ্রেটেড স্কুল - যেখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রবেশাধিকারের কোনো বাধা নাই, কিন্তু ইস্কুল পরিকাঠামোর তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না, যা হলে তবেই একমাত্র শিশু ইস্কুলে এসে স্বস্তিতে কোনো কাজ করতে পারবে। এও এক আশ্চর্য অবস্থা - যেন ইচ্ছা নাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূলস্রোতে আনার, কেবল বাধ্যতা, দরজা খুলে রাখতে হচ্ছে।

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আসে ইনক্লুসিভ স্কুলের ধারণা। এখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্য কেবল ইস্কুলের দরজা খোলা থাকবে না, মূলস্রোতের সাধারণ ইস্কুল নিজেকে গঠনে, পাঠক্রমে, শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নে বদলাবে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের অধিকারের লড়াই, তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে দেশে তৈরি আইন, এবং শিশু বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন (আর টি ই অ্যাক্ট ২০০৯)-এর কারণে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এ দেশে সব সরকারি ইস্কুলের ধারণাই তাত্ত্বিকভাবে ইনক্লুসিভ। কিন্তু বাস্তবে সেগুলি কতটা ইনক্লুসিভ তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে প্রতি মুহূর্তে।

গঠনগত দিক দিয়ে প্রতিটি ইস্কুলে থাকতে হবে র‍্যাম্প, যাতে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারি শিশু ইস্কুলের প্রতিটি জায়গায় অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত দুশ্চিন্তাজনক সংখ্যায় ইস্কুলে এখন এই সর্বজনীন অ্যাকসেসের বিষয়টির সমস্যা মেটেনি। এমনকি র‍্যাম্প থাকলেও তা শিশুকে পৌঁছে দিতে পারে না ইস্কুল বাড়ির সর্বত্র। ইস্কুলে ইস্কুলে বিশেষ ধরনের শৌচাগার নেই।

নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে স্পেশাল এডুকেটর, যাঁদের উপস্থিতি ছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা, সার্বিক বিকাশ আদৌ সম্ভবই না। অনেকগুলি ইস্কুল পিছু একটি করে রিসোর্স রুম রয়েছে, যেখানে সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন করে স্পেশাল এডুকেটররা আসেন তাঁর আওতাভুক্ত সব ইস্কুলের সব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশে শিখতে সাহায্য করার জন্য। আবার সাধারণ শিক্ষকদের জন্য এমন কোনো কার্যকরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই যার সাহায্যে তাঁরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিখতে সাবলীলভাবে সাহায্য করতে পারেন। অর্থাৎ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা না পায় সপ্তাহে ছয় দিন স্পেশাল এডুকেটরের সাহায্য না পায় সাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে স্পেশাল এডুকেশনের সাহায্য। এই সব কটির থেকেই বঞ্চিত। তাহলে ইস্কুলে আসা কেন? কেবলই ''অন্তর্ভুক্তিমূলক ইস্কুলের'' মুখরক্ষা করতে?

সরকারি ইস্কুলে আসা বেশিরভাগ শিশু, সে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হোক বা সাধারণ, আর্থ-সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের - শিক্ষা মৌলিক অধিকার যে দেশে, সেখানে ইস্কুলের বাইরে প্রাইভেট স্পেশাল এডুকেশনাল বন্দোবস্ত করা কেবল তার পরিবারের দায় নয়-ই না, সামর্থ্যেরও বাইরে। তারা কেবল তাদের বিশেষ চাহিদার জন্য সমাজে অন্তরণের শিকারই নয়, আর্থ-সামাজিকভাবেও সমর্থ সমাজটার থেকে বহির্ভূত।

এই লেখার উদ্দেশ্য বিশেষ চাহিদারসম্পন্ন মানুষ বিশেষত শিশু কিভাবে এই দেশে, রাষ্ট্রের দায়হীনতার কারণে এবং সামাজিক ঔদাসীন্যতার কারণে শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, মূলস্রোত, থেকে বহির্ভূত, অন্তরণক্লিষ্ট - তার একেবারে বুনিয়াদি ধারণা নিয়ে চর্চার সূচনাটুকু করা। ত্রিশ বছর পার হয়েছে রাষ্ট্র সংঘ ৩রা ডিসেম্বর তারিখটিকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে - আমরা শুনেছি, পড়েছি, জেনেছি, মনেও রাখি। কিন্তু সমাজের সদস্য যে মানুষ তার বিশেষ কোনো চাহিদার কারণে যদি গোটা সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে তাকে কেবল বহির্ভূতই হতে হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ভাঙল কে — রাষ্ট্র নয়, সমাজ নয়? ব্যর্থ হল কে - রাষ্ট্র নয়, সমাজ নয়? প্রতিবন্ধী আসলে কে - রাষ্ট্র নয়, সমাজ নয়? এই প্রশ্নগুলির একশ ভাগ যুক্তিযুক্ত উত্তর যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কাছেও না পাই - তখন বুঝতে হয়, আমাদের চিন্তার ধারার বদলের প্রয়োজন তো আছেই, একই সঙ্গে প্রয়োজন আছে রাষ্ট্রকে, সমাজকে অবিরাম প্রশ্ন করে চলারও।

উৎসব - ২০২২

শ্রী অনিমেষ লাহিড়ী, *সম্পাদক, গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র*

গঙ্গারামপুর ঃ প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো স্টুডেন্টস হেলথ্ হোম, গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত **'উৎসব-২০২২'**।

শহরের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় গঙ্গারামপুর হাইস্কুলে এই উৎসবকে সামনে রেখে গত২৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে হাইস্কুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় নৃত্য, সংগীত ও বাচিক শিল্পীগণ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়াও, কালিয়াগঞ্জের ''অনন্য থিয়েটারের'' পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় শিশু কিশোর নাটক **''মুখোমুখি''**।

৩০শে ডিসেম্বর সকাল ১০টায় গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তি থেকে শুরু হয় এক সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। রাজ্যের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিযোগী, অভিভাবক, শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, স্টুডেন্টস হেলথ হোমের নেতৃত্ব এবং শুভানুধ্যায়ীগণ শোভাযাত্রায় পা মেলান। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ব্যান্ড, গানের ট্যাবলো, ক্যারাটে প্রভৃতি এই শোভাযাত্রার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শহর পরিক্রমা করে তা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে শেষ হয়। এরপর হাইস্কুল প্রাঙ্গনে এবং মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। হেলথ হোমের পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় হোমের সভাপতি ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে হোমের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

সারা রাজ্য ব্যাপী হোমের বর্তমান কর্মকান্ড, ছাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও উন্নতিকরণ, সকলের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা উন্মুক্তকরণক, মানসিক-শারীরিক-সামাজিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে বর্ষব্যাপী কর্মকান্ড সহ উৎসব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী। তিনি মঞ্চে ঘোষণা করেন ২০২৩ সালের উৎসব হাবড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হবে।

গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাননীয় সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ী স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করতে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উৎসব-২০২২ এর স্মরণিকা প্রকাশ করেন মাননীয় রাজ্য কার্যকরী সভাপতি। এরপর হাইস্কুলের শ্রেণীকক্ষে এবং পার্শ্ববর্তী মাঠে সংগঠিত হয় যথাক্রমে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

রাজ্যের ২৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে ৩৫৫ জন প্রতিযোগী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ৪৩৫ জন অভিভাবক অভিভাবিকা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। গঙ্গারামপুর ছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে ৫৫ জন সম্মানীয় সংগঠক উপস্থিত থেকে উৎসবকে সফল করতে সহযোগিতা করেন। গঙ্গারামপুরের প্রায় ৪৭ জন শিক্ষক সংগঠক, ১০৫ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং ৮৮ জন বিচারক এই প্রতিযোগিতাকে সফল করে তুলেছেন। সমগ্র উৎসবকে সফল করে তুলতে গঙ্গারামপুর পৌরসভা নানাবিধ সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

উৎসবের প্রাণকেন্দ্র গঙ্গারামপুর হাইস্কুল হলেও গঙ্গারামপুর গার্লস হাইস্কুল, দমদমা অমলবন্ধু বিদ্যানিকেতন, রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, গঙ্গারামপুর বি. এড. কলেজ, এবং বিদ্যাসাগর কলেজ অফ্ এডুকেশনে আবাসন তৈরী করা হয়। দমদমা অমলবন্ধু বিদ্যানিকেতনে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

৩০শে ডিসেম্বর বিকেল ৩টা থেকে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। উৎসব কমিটির সভাপতি মাননীয় আনিসুল আলম চৌধুরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণের মাধ্যমে শেষ হয় **''উৎসব - ২০২২''**।

বহরমপুর

বহরমপুর স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর উদ্যোগে এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সহযোগিতায় বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট ট্রেকার স্ট্যান্ডের বস্তিতে ২৭/১০/২০২২ পালন করা হলো ভাইফোঁটা। সেখানে ওই বস্তির প্রায় ৪৫ জন বাচ্চা উপস্থিত ছিল। এই বস্তিতে এই প্রথম ভাইফোঁটা হল এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগই এই প্রথম ভাইফোঁটা পেল। উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক বিউটি চন্দ্র সহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ এবং স্বেচ্ছাসেবক সেবিকারা। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন সোমা ভৌমিক এবং অন্যান্য মেম্বাররা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বাচ্চারা ভীষণ আনন্দ পেয়েছে এবং তারা মিষ্টি খেতে খেতে পরম তৃপ্তির সাথে বলেছে যেন সামনের বছরও এরকম অনুষ্ঠান করা হয়। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেকের হাতে খাতা পেন তুলে দেওয়া হল। ভাইফোঁটা উদ্‌যাপন শেষ হয় হোমে সন্ধ্যায় সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে ভাইফোঁটা ও বোনফোঁটা পালনের মধ্য দিয়ে।

গত ৬/১১/ ২০২২ তারিখ উৎসব ২০২২ এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন কমিটির সহ সভাপতি শ্রী শ্যামল কুমার সাহা মহাশয়। বিশেষ অতিথি বরিষ্ঠ সংগঠক শ্রী প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়। সভার সভাপতিত্ব করেন স্টুডেন্টস হেলথ হোম বরহমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভানেত্রী শ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তী মহাশয়া।অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্য উৎসবে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়।

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের দক্ষিণবঙ্গের ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রায় ৮০ জন ছাত্রী ১৪/১১/২০২২ তারিখ শিশু দিবসে স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় উৎসব ২০২২ এর অন্তর্গত আন্তঃআঞ্চলিক কেন্দ্র খোখো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শক্তি মন্দির মাঠে। অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন সভানেত্রী সুজাতা চক্রবর্তী মহাশয়া। ক্রীড়ার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রী জগন্ময় চক্রবর্তী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি শ্রী শ্যামল কুমার সাহা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী কৃষ্ণেন্দু রায়, JJB এর Social worker member শ্রী পুরুষোত্তম কেশরী এবং CWC এর সদস্য শ্রী বিপ্লব মন্ডল মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির অপর সহ সভাপতি মাননীয় নাজেশ নওয়াজ মহাশয়। খেলায় বিজয়ী দল মেদিনীপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের বিজয়ী দলের সাথে রাজ্য উৎসবে ৩০/১২/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত একমাত্র খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

গত ২৩/১১/২২ তারিখে বেলডাঙ্গা এস.আর.এফ. কলেজে স্টুডেন্টস হেলথ হোম বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সচতনতা শিবির আয়োজন করা হয়। শিবিরে ডেঙ্গু বিষয়ক আলোচনা ও পরামর্শ বিষয়ে অত্যন্ত মনোজ্ঞ একটি আলোচনা করেন ইএনটি বিশেষজ্ঞ তথা হোমের পরিচালন কমিটির সদস্য ডাঃ সৌমেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ডঃ সুহাস রায়, এনএসএস-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুমিত চৌধুরী সহ একাধিক অধ্যাপক, আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদিকা বিউটি চন্দ্র, সংগঠক শ্রী প্রলয় সাহা এবং স্বেচ্ছাসেবক মহঃ মোস্তাফা আল আমিনুল। আনুমানিক ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৭/১১/২০২২, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের ডেন্টাল ক্লিনিকটি দন্ত চিকিৎসক ডাক্তার উদয়ন উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদের জেলা সম্পাদক মাননীয় শ্রী দুলাল দত্ত মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মাদ্রাসা ও বিদ্যালয়ের প্রদান শিক্ষক-শিক্ষিকা ডঃ জয়ন্ত দত্ত, শ্রী গৌতম ব্যানার্জি, মুর্শিদা খাতুন, এমদাদুল হক, প্রাক্তণ প্রধান শিক্ষক সাখাওয়াত হোসেন সহ একাধিক সহশিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। হোমের জিয়াগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রী অনুপ চক্রবর্তী, বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভানেত্রী শ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তী, সম্পাদিকা শ্রীমতী বিউটি চন্দ্র-ও উপস্থিত ছিলেন। সপ্তাহে তিন দিন উনি ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন। সাথে স্থানীয় ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের স্বার্থে শীঘ্রই সান্ধ্যকালীন ডেন্টাল ক্লিনিক শুরু হতে চলেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণের পক্ষ থেকে ক্লিনিকটিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিষেবা নিতে পাঠানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করা হয়।

গত ৫/১২/২০২২ তারিখ সোমবার ১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই শিবিরে স্টুডেন্টস হেলথ হোম বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ডাঃ অনিমেষ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে ৪৮ জন ছাত্রছাত্রীর সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা কহা হয়। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তাদের হোমের ফার্মাসি থেকে ওষুধও দেওয়া হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে আজ ছাত্রছাত্রীদের চোখ, দাঁত, মানসিক স্বাস্থ্য, হোমিওপ্যাথি বিভাগের চিকিৎসক দ্বারাও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সুন্দর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অদিতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়া সহ সকল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

৭/১২/২০২২ তারিখ বুধবার সেবা মিলনী উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ) এর উদ্যোগে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ঝাড়গ্রাম

৩/১২/২০২২ স্টুডেন্টস হেলথ হোম, ঝাড়গ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রে রক্তদান শিবিরে মোট ২৮ জন দাতা রক্তদান করেন। দুইজন মহিলা রক্তদাতা হিসাবে রক্তদান করেন। প্রথমবার রক্তদান করেন দুই জন ব্যক্তি।

নর্থ হুগলি আঞ্চলিক কমিটি

নর্থ হুগলি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির ২১শে অক্টোবর ২০২২, ৫০ জন রক্তদাতা সহ পূর্ববতী ২রা এপ্রিল হইতে অদ্য ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত আয়োজিত রক্তদান অনুষ্ঠানে (মোট ৯টি ক্যাম্পে) ৫১৮ জন রক্ত দান করেন।

How to stay mentally fit after COVID-19 pandemic

Dr. Sudarsan Ray, *Psychiatrist*

We all are aware that the COVID-19 pandemic has created havoc in our lives. While we are mostly aware of the physical and economic consequences of COVID-19 pandemic, we have largely ignored the mental aspect of COVID-19 pandemic.

The fact that COVID-19 has resulted in the death of many near and dear ones in our families or families whom we know, has traumatised a large section of the population globally. Also the economic crises arising out of the COVID-19 pandemic has resulted in widespread losses for the business men, the professionals and of course the service holders. Worldwide prevalence of anxiety, depression and marital discord have shown an exponential increase in number. The incidences of suicide have also shown a steep rise in number.

One of the most common fallouts of COVID-19 infection has been Brain fogging where the patient cannot think clearly at times. The immune response which protects our body from many infections is also another fall-out of the COVID-19 pandemic. Drinking & smoking problems have shown a stiff increase.

Hence it is always desirable that whenever you feel you are stressed and/or distressed never hesitate to visit a mental health professional and seek help It's interesting to note that many of the mental health problems arise 5/6 months after the actual infection takes place.

Remember, mental health problem is just another health problem like cough and cold etc. Never feel shy to visit a Psychiatrist and seek professional help.

Bring back the age old adda sessions. Telephone or physically visit the relatives and spend quality time with them. Tell your friend with whom you had lost in touch, the joke you like since school days. Do not WhatsApp it. Once again indulge in your favourite hobby. Go for that walk or jogging. Se that famous movie by visiting the cinema hall. Play the sport which you have not played for very many years.

All these will help you overcome the various mental health problems. If medication is required, the psychiatrist will prescribe it.

To round it off, please remember the you are the person who will actually cure yourself. Hence unless you wish to cure yourself, no professional can cure you. So keep this in mind and assume control of your mental health problems for a cure.

স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুদ্রণ গ্রাফিকা, ৪১, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ৯৮৩১৮৫১৮৯৭